দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

উপজাতিদের প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা

প্রচলন প্রসঙ্গ

ডঃ রাজীব হুমায়ুন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে ৩৫টি উপজাতি তথা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বসবাস। উপজাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চাকমা, মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, হাজং, খাসিয়া, কুকি, লুসাই, মুরং, পাংখু ইত্যাদি। চাকমা মারমাসহ কয়েকটি প্রধান উপজাতি বসবাস করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলের পাহাড়ী অঞ্চলে গারো-হাজং; কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীতে রাখাইন; সিলেটের পাহাড়ী এলাকায় খাসিয়া এবং রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেন সাঁওতাল জনগোষ্ঠী।

বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। উপজাতিদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহু কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ১৯৯০ সালের দিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে তৎকালীন সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৩৮৩টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বর্তমান সরকারের আমলেও আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। প্রত্যেকটি স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম নিঃসন্দেহে বাংলা। প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সাধারণত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নামানুসারে এসব ভাষার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, চাকমা ভাষা, মারমা ভাষা, গারো ভাষা, সাঁওতাল ভাষা ইত্যাদি। লুসাই, ত্রিপুরা, ওরাওঁ এবং গারোদের ভাষাসমূহ যথাক্রমে 'দোলেন', 'হাল্লামি', 'কংরুক' এবং মান্দিকুচিক নামেও পরিচিত। [আবদুস সাত্তার ঃ 'আরণ্য জনপদে'] প্রত্যেক উপজাতিরই মাতৃভাষা প্রীতি রয়েছে এবং অধিকাংশ উপজাতি বাংলা বলতে, পড়তে অথবা লিখতে পারে না। অধিকাংশ উপজাতি শিশু বাংলা বুঝতেও পারে না। ভাষা পরিস্থিতি যদি এ ধরনের হয়, তাহলে উপজাতি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটবে কি? অবিলম্বে যদি উপজাতি এলাকায় তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কর্মসূচী গৃহীত না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কোন অবস্থাতেই ঘটবে না। বলা প্রয়োজন, সম্প্রতি সম্পাদিত শান্তি চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাইমারী স্কুলসমূহে উপজাতি-ভাষা চালু করবার কথা বলেছে। কিন্তু উপজাতিদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার কোথাও প্রাইমারী শিক্ষা চালু রয়েছে বলে শুনিনি। শান্তি চুক্তির সাফল্য কামনা করলে উপজাতি ভাষা প্রচলন প্রসঙ্গে পাহাড়ীদের মনোভাব বোঝা দরকার। যেমন হেমল দেওয়ান লিখেছেন, "মূলত আদিবাসী শিশুরা স্কুলে জ্ঞান অর্জনের পথে যে বাধাগুলোর সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে অন্যতম ভাষাগত সমস্যা। পাঠ্য পুস্তকের ভাষা বাংলা, অন্যদিকে অধিকাংশ আদিবাসীর ভাষা কুকিচীন ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। বাংলা ভাষার সাথে চীনা ভাষার যে দূরত্ব, অধিকাংশ আদিবাসী ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সে দূরত্ব। স্কুলগুলোতে শিক্ষকরা পাঠদান করেন বাংলায়। অন্যদিকে আদিবাসী শিশু নিজ মাতৃভাষাকে সম্বল করে স্কুলে পদার্পণ করে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে তৃতীয় বিশ্বের ইংরেজী না জানা কোন নেতার দোভাষীবিহীন মুখোমুখি আলোচনার সাথে আদিবাসী শিশু ও বাংলায় পাঠদানরত শিক্ষার কাল্পনিক তুলনা করা চলে। মা-বাবার বকুনি আর শিক্ষকদের হাতের বেতের ভয়ে কোন কোন আদিবাসী শিশু শেষ পর্যন্ত স্কুলের গণ্ডি পেরোলেও বাকি অধিকাংশের অবস্থা তথৈবচ। এছাড়াও বিষয়বস্তুর সাথে আদিবাসী শিশুর কোন পূর্বপরিচয় না থাকায় তা শিশু মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। জন্ম থেকেই যে পাহাড়, ঝরনা, সবুজ বন এবং আদিবাসী জীবনযাত্রা শিশুর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তার কিছুই সে পায় না স্কুলের বইগুলোতে।" 'প্রাথমিক স্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মাতৃভাষা প্রচলন প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সুখেশ্বর চাকমা পন্টু লিখেছেন, "পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী শিশুদের বাংলার মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয়। যার ফলে প্রাথমিক পর্যায় শিক্ষা গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এ সমস্যা দেখা দেয়। কেননা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ভাষাগত দুর্বলতার কারণে শিক্ষার ভিত্তিও দুর্বলভাবে গড়ে ওঠে। যে আদিবাসী শিশু জীবনে বাংলা কথা বলেনি বা অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে সে বাংলা কখনও শোনেনি। তাকে স্কুলে ভর্তির পর যদি বাংলা ভাষায় পড়াশোনা শুরু করতে হয়, এ ব্যবস্থাটি কতটুকু বৈজ্ঞানিক, তা ভেবে দেখা দরকার। এটি নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার প্রায়োগিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষাকে আরও সহজবোধ্য করবে, শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তু সহজে প্রবেশ করবে। এতে শিক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধি, মৌলিক চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন সহজতর হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে আদিবাসী জনগণের শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন অতীব জরুরী।

সুগত চাকমা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রবন্ধাবলীতে উপজাতীয় ভাষার প্রচলন প্রসঙ্গে তাঁর মতামত লিখে চলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজা দেবাশিস রায়, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি এবং জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জা-ক)-এর ঝিমিত-ঝিমিত চাকমা, শিশির চাকমা ও মৃত্তিকা চাকমাসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। এদের সকলেই পাহাড়ী এলাকায় প্রাইমারী স্কুলে উপজাতি ভাষার প্রচলনের পক্ষে মত প্রদান করেছেন।

আমাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাব— উপজাতি এলাকায় ত্রিভাষা পলিসি গহীত হোক। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় ভাষায় পাঠদান করা হবে। ৪র্থ শ্রেণী থেকে উপজাতি ভাষার সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজী চালু করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে উপজাতি ভাষা প্রচলন করতে চাইলে উপজাতি ভাষার ব্যাকরণ, বর্ণমালা এবং লিখিত রূপ আছে কিনা। উত্তরে বলা দরকার চাকমা এবং মারমা জনগণের নিজস্ব বর্ণমালা আছে এবং এসব বর্ণমালা অনুসারে দুই একটি 'প্রাইমার'ও রচিত হয়েছে। আমার সংগ্রহে এসব 'প্রাইমার' রয়েছে। তবে এসব বর্ণমালা এবং 'প্রাইমার' কার্যক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ভাষা প্রীতির মতো তাদের নিজস্ব বর্ণমালা প্রীতি রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো ৩৫টি উপজাতির জন্য ৩৫টি বর্ণমালায় লিখিত রূপ তৈরি করা আপাতত সম্ভব নয়। তাছাড়া, উপজাতি এলাকায় কোন সুনির্দিষ্ট 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' নেই।

যেহেতু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলায় বর্ণমালা ও বাংলা ভাষায় অংশগ্রহণ করতে হবে সেহেতু প্রত্যেক উপজাতির জন্য বাংলা বর্ণমালা প্রস্তাব করছি। অর্থাৎ উপজাতিদের ভাষা বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হবে। বলা প্রয়োজন, ভারতের মনিপুরী ভাষা বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে। এ জন্য তাদের মধ্যে কোন হীনম্মন্যতা বোধ নেই। বলা দরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বাংলা বর্ণমালায় বহু কবিতা গান বেশকিছু দিন হতে লিখিত হয়ে আসছে। উদাহরণ—যম চুগর যম/ রেঙ্গো 'ন' বেড়ায় কম/ চা খায় কুম তিগে/ তোগায় হেরা মাজর ভাত পোই/ ভাত পোইত্তুন উধিলে দুল খায় এক ওগোই। (শিশির চাকমা, ঘিলে কোজোই বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন-'৯৭)।

বাংলা বর্ণমালায় উপজাতি ভাষা প্রচলন প্রসঙ্গে উপজাতি নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছি। নিজস্ব বর্ণমালা প্রীতি থাকলেও তাঁরা আপাতত বাংলা বর্ণমালা মেনে নিতে রাজি আছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যদি বাংলা বর্ণমালায় চাকমা ভাষা লিখিত হয় তবে চাকমা ভাষার সব ধ্বনি বাংলা বর্ণমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে কি? অথবা আরও সহজ করে বলা যায়— চাকমা মারমা ভাষায় এমন অনেক ধ্বনি আছে যেগুলো বাংলা বর্ণমালায় লেখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কি হবে? উত্তরটা এ রকম ধরা যাক, মারমা ভাষার একটি ধ্বনি বাংলা বর্ণমালায় নেই। সে ক্ষেত্রে মারমা অঞ্চলে প্রচলনের জন্য আমরা বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে নতুন একটি বর্ণ সংযোজন করে দিতে পারি।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। দেশের ভাষা বিজ্ঞানীবৃন্দ উপজাতি ভাষার ব্যাকরণ ও বর্ণমালা অতি সহজেই রচনা করতে পারবেন এবং বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বর্ণ সংযোজন করতে পারবেন। পাহাড়ী এলাকায় প্রাইমারী স্কুলসমূহে তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হলে "প্রাইমার" দরকার হবে। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলের বই রচনার জন্য দরকার হবে 'প্রাইমার' বিশেষজ্ঞের। 'প্রাইমার' রচনার সময় তথা 'প্রাইমার'-এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় বিশেষজ্ঞদের মনে রাখতে হবে পাহাড়, ঝরনা, পাহাড়ী নদী, গভীর অরণ্য তথা সামগ্রিক আরণ্যক জনপদের কথা।

১৯৫৭ সালের ৫ জুন International Labour organisation-এর ৪০তম অধিবেশনে আদিবাসী ও উপজাতীয়দের সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কনভেনশন-১০৭ নামে কতিপয় নীতিমালা গৃহীত হয়। এ কনভেনশন ১০৭-এর ২৩ (১) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিশুদিগকে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় অথবা সম্ভব না হলে যে ভাষা তাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত সেই ভাষায় শিক্ষা প্রদান করতে হবে (সুখেশ্বর চাকমা পন্টু)। এ কনভেনশনের নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ভারত তাদের দেশের ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য 'ত্রিভাষী নীতি' (একটি প্রাদেশিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী) গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের উপজাতি এলাকার জন্যও ত্রিভাষা নীতি (সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একটি উপজাতি ভাষা, বাংলা ও ইংরেজী) গৃহীত হতে পারে। এ নীতি গৃহীত হলে সামগ্রিক শিক্ষার হার বাড়বে এবং বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার স্কুলসমূহে ঝরে-পড়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।